أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ص)

www.motaher21.net

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْض

এ রাসূলগণ এরূপ যে, তাদের মধ্যে কাউকে অন্য কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

Those apostles We endowed with gifts some above others.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫৩

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

এই রসূলদের (যারা আমার পক্ষ থেকে মানবতার হিদায়াতের জন্য নিযুক্ত) একজনকে আর একজনের ওপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অবশেষ ঈসা ইবনে মারয়ামকে উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দান করেছেন এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে এই রসূলদের পর যারা উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দেখেছিল তারা কখনো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। কিন্তু (লোকদেরকে বলপূর্বক মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না, তাই) তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো, তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। হ্যাঁ,, আল্লাহ চাইলে তারা কখ্খনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন।

২৫৩ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা ‘আলা কতক রাসূলকে কতক রাসূলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সকল রাসূল মর্যাদার দিক দিয়ে সমান নয়। যেমন মূসা (আঃ)-এর সাথে সরাসরি কথা বলে ‘কালিমুল্লাহ’ র মর্যাদা দিয়েছেন, অন্য কোন রাসূলের সাথে এরূপ সরাসরি কথা বলেননি। ঈসা (আঃ)-কে জিবরীল দ্বারা সহযোগিতা করেছেন এবং পিতা ছাড়া শুধু মায়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরণ করে ‘রূহুল্লাহ’ র মর্যাদা দিয়েছেন, অন্য কোন রাসূল পিতা ছাড়া জন্ম লাভ করেনি।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا)

“আমি নাবীগণের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবূর দিয়েছি।” (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৫৫)

নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সকল নাবীর শেষ নাবী এবং সারা জাহানের জন্য প্রেরণ করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, অন্য কোন নাবীকে সারা জাহানের জন্য প্রেরণ করেননি। এছাড়াও তাঁকে অনেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

فُضِّلْتُ عَلَي الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ :أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَي الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

‘আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্যান্য নাবীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ১. আমাকে অল্প কথায় অনেক কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। ২. শত্র “রা আমাকে ভয় করবে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে। ৪. সমস্ত জমিনকে আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ও সিজদার স্থানস্বরূপ করে দেয়া হয়েছে। ৫. আমি সকল সৃষ্টির জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। ৬. আমার দ্বারা নবুওয়াত সমাপ্ত হয়েছে।’ (সহীহ মুসলিম হা: ৫২৩)

আল্লাহ তা ‘আলা কতক রাসূলকে কতক রাসূলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোন নাবী বা রাসূলকে অন্য কোন নির্দিষ্ট নাবী বা রাসূলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّي

কোন ব্যক্তির উচিত নয় এ কথা বলা যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ) থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী হা: ২৩৯৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা আমাকে মূসা (আঃ)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিওনা। (সহীহ বুখারী হা: ২৪১১) অতএব আমরা বিশ্বাস করব কতক রাসূল কতকজনের ওপর শ্রেষ্ঠ কিন্তু কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করব না।

(وَلَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوْا)

'আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হত না' অর্থাৎ রাসূলগের মর্যাদায় তারতম্য থাকলেও সকলের দীন ছিল একটিই, তাদের দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ তা 'আলার তাওহীদের দিকে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির লোকেরা পরস্পরে মতনৈক্যের কারণে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরী করেছে। এমনকি এ কারণে তাদের মাঝে মারামারি সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা 'আলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে সঠিক পথে রাখতে পারতেন, তাদের মাঝে মতনৈক্য সৃষ্টি হতো না। তাদের ঝগড়া-বিবাদ, মতভেদ এসব কিছু আল্লাহ তা 'আলার পক্ষ হতে পূর্ব নির্ধারণ করা তাকদীরের আলোকে। অর্থাৎ তারা কী করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা 'আলা জানতেন, সে জ্ঞানানুযায়ী তাদের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। অতএব তারা সে তাকদীর অনুযায়ী আল্লাহ তা 'আলার ইচ্ছায় সব কিছু করে থাকে।

অর্থাৎ রসূলদের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করার পর মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, এর কারণ এ ছিল না যে, নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ অক্ষম ছিলেন এবং এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি চাইলে নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষমতা করো থাকতো না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও সংকল্প ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশেষ কর্মনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করা তাঁর ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে পয়দা করেছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন। নবীদেরকে তিনি মানুষের ওপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কাজেই জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। বরং নবীদেরকে তিনি পাঠান যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানাবার জন্য। কাজেই যতো মতবিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে তার পেছনে এই একটি মাত্র কাজ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন আর তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালাতে চাইছিলেন কিন্তু নাউযুবিল্লাহ এ ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি।

‘কথা বলা’ আল্লাহ্ তা'আলার একটি গুণ। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা শ্রুত বাক্য দ্বারা কথা বলেন। কথা বলার এ গুণটির উপর কুরআন ও সুন্নাহর বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ “এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন” । [সূরা আন-নিসাঃ ১৬৪]

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ “আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন মূসা বললেনঃ হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব” । [সূরা আল-আ’রাফঃ ১৪৩]

আর সুন্নাহ হতে দলীল হলো, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আদম ও মূসা বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। মূসা আদমকে বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে নিরাশ করে আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আদম তাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ্ আপনাকে কথপোকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং নিজ হস্তে আপনাকে তাওরাত লিখে দিয়েছেন.....। [বুখারীঃ ৬৬১৪, মুসলিমঃ ২৬৫২]

তবে মূসা ‘আলাইহিস সালাম-এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বললেও তা অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার

(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ)

(কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়) আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পর কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সূরা আশ্-শুরার সে আয়াতটি দুনিয়ার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

মহান আল্লাহ্ কতিপয় নবীকে অন্যান্যনবীদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, রাসূলগণের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন অন্য জায়াগয় রয়েছেঃ

﴿وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا﴾

‘আমি তো নবীদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছি; আর দাঊদ (আঃ) -কে আমি যাবুর কিতাব দিয়েছি।’ (১৭নংসূরাহ্ইসরাহ, আয়াত নং৫৫) এখানেও এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বয়ং মহান আল্লাহ্র সাথে কথা বলারও মর্যাদা লাভ করেছেন। যেমন মূসা (আঃ) , মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আদম (আঃ) ।

সহীহ ইবনু হিব্বানে একটি হাদীসে মি ‘রাজের বর্ণনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কোন্ আকাশে কোন্ নবী (আঃ) কে পেয়েছিলেন তারও বর্ণনা রয়েছে। (হাদীসটি য ‘ঈফ। সহীহ ইবনু হিব্বান-১/১৯১/৯৪) নবীগণের মর্যাদা কম-বেশি হওয়ার এটাও একটা দলীল।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহূদীর মধ্যে কিছু দ্বন্ধ হয়। ইয়াহূদী বলেঃ ‘সেই মহান আল্লাহ্র শপথ যিনি মূসা (আঃ) -কে সারা জগতের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন।’ মুসলিমটি এ কথা সহ্য করতে না পেরে তাকে এক চড় মারেন এবং বলেনঃ ‘ওরে খবীস! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতেও তিনি শ্রেষ্ঠ?’ ইয়াহূদী সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলিমটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفِيقُ فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟ فَلَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ.

‘তোমরা আমাকে নবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। কিয়ামতের দনি সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমার জ্ঞান ফিরবে। আমি দেখবো যে, মূসা (আঃ) মহান আল্লাহ্র ‘আরশের পায়া ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, আমার পূর্বে তাঁরই জ্ঞান ফিরেছে নাকি তিনি আসলে অজ্ঞানই হোননি, না-কি তূর পাহাড়ের অজ্ঞান হওয়ার বিনিময়ে আজ মহান আল্লাহ্ তাঁকে অজ্ঞান হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আমাকে নবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।’ (সহীহুল বুখারী-৬/৫১৯/৩৪১৪, ফাতহুল বারী -৬/৫০৮, সহীহ মুসলিম-৪/১৫৯/১৮৪৩) এই হাদীসটি কুর’ আনের এই আয়াতটির বিপরীত বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দু’ য়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা কিছু নেই।

এ কথার ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ফায়সালা তোমাদের অধিকারে নেই, বরং এ ফায়সালা হবে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে। তিনি যাঁকে মর্যাদা দান করবেন তোমাদেরকে তা মেনে নিতে হবে। তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মহান আল্লাহ্র নির্দেশকে মেনে নেয়া ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.

কোন নবীকে অন্য কোন কোন নবীর ওপর প্রাধান্য দিবে না। (ফাতহুল বারী ৬/৫১৯, সহীহ মুসলিম৪/১৮৪৪)

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَاٰتَيْنَاعِيْسَابْنَمَرْيَمَالْبَيِّنٰتِ﴾ ‘ঈসা (আঃ) -কে তিনি এমন স্পষ্ট দলীলসমূহ প্রদান করেছেন যেগুলো দ্বারা বানী ইসরাঈলের ওপর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর রিসালাত সম্পূর্ণরূপে সত্য। আর সাথে সাথে এটাও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ‘ঈসা (আঃ) অন্যান্য বান্দাদের মতো মহান আল্লাহ্র একজন শক্তিহীন ও অসহায় বান্দা ছাড়া আর কিছুই নন। আর তিনি পবিত্রাত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন যে, পরবর্তীদের মতবিরোধও তাঁর ইচ্ছারই নমুনা। তাঁর মাহাত্ম্য এই যে, ﴿وَلٰكِنَّاللّٰهَيَفْعَلُمَايُرِيْدُ﴾ তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

[১] কুরআন অন্য আর এক স্থানেও এ কথা বর্ণনা করেছে।

{وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} "আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

(বানী-ইস্রাঈল ১৭:৫৫) কাজেই এ প্রকৃতত্বের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। তবে নবী করীম (সাঃ) যে বলেছেন, "তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।" (বুখারী ৪৬৩৮, মুসলিম ২৩৭৩নং) এ থেকে একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অস্বীকৃতি সাব্যস্ত হয় না, বরং এ থেকে উম্মতকে নবীদের ব্যাপারে আদব ও সম্মান দানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যেহেতু সে সমূহ বৈশিষ্ট্য ও বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত নও, যার ভিত্তিতে তাঁদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাই তোমরা আমার শ্রেষ্ঠত্বও এমনভাবে বর্ণনা করো না, যাতে অন্য নবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। নবীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত নবীদের উপর সর্বশেষ নবী (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তো সুসাব্যস্ত বিষয় এবং আহলে সুন্নাহর ঐকমত্যপূর্ণ বিশ্বাস; যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ ফাতহুল ক্বাদীর)

[২] অর্থাৎ, সেই সব মু'জিযা যা ঈসা (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে-ইমরানে আসবে। 'রূহুল ক্বুদুস' থেকে জিবরীল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর এ কথা পূর্বেও অতিবাহিত হয়েছে।

[৩] এই বিষয়টাকে মহান আল্লাহ কুরআনের কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর নাযিল করা দ্বীনে মতভেদ পছন্দনীয়। এটা তো আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয়। তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক জিনিস হল, সমস্ত মানুষ তাঁর নাযিল করা শরীয়তকে অবলম্বন করে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাক। এই জন্যই তিনি গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন, ক্রমাগতভাবে নবীদেরকে প্রেরণ করেন এবং নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করে রিসালাতের ইতি টানেন। এর পরও খলীফাগণ, উলামা এবং দ্বীনের আহবায়কদের মাধ্যমে সত্যের প্রতি আহবান, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদানের ধারাবাহিকতা জারী রাখা হয় এবং তার গুরুত্বকে তুলে ধরে তার প্রতি তাকীদও করা হয়। এত ব্যবস্থা কেন? এই জন্যই যে, মানুষ যাতে আল্লাহর পছন্দনীয় পথকে অবলম্বন করে। কিন্তু যেহেতু তিনি হিদায়াত ও গুমরাহীর উভয় পথ প্রদর্শন করে দিয়ে মানুষকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার জন্য বাধ্য করেননি, বরং পরীক্ষার জন্য তাকে (কোন একটি পথ) নির্বাচন করার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন, সুতরাং কেউ এই

এখতিয়ারের সদ্ব্যবহার করে মু'মিন হয়ে যায়, আবার কেউ এই এখতিয়ারের অসদ্ব্যবহার করে কাফের হয়ে যায়। অর্থাৎ, এটা তাঁর কৌশল ও ইচ্ছা সম্পর্কীয় বিষয়; যা তাঁর সন্তুষ্টি ও পছন্দ থেকে ভিন্ন জিনিস।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মর্যাদার ক্ষেত্রে রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য রয়েছে, সকলের মর্যাদা সমান নয়।

২. রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা যাবে না।

৩. "আল্লাহ তা 'আলা কথা বলেন" এ গুণ প্রমাণিত হল।

৪. "আল্লাহ তা 'আলা ইচ্ছা করেন" এ গুণ প্রমাণিত হল।

৫. দীনের মাঝে মতানৈক্য করা নিন্দনীয়।

৬. মানুষ যা কিছু করবে আল্লাহ তা 'আলা তা পূর্ব থেকে জানেন, সে জ্ঞানানুযায়ী মানুষের ভাল-মন্দ তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সে অনুযায়ী মানুষ আমল করে থাকে।